পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

সিনেকবিতা বনাম কবিতাচিত্র - ২

"The cinema seems to have been invented to express the life of the subconscious, the roots of which penetrate poetry so deeply" - Luis Buñuel

একুশ বছর আগে লেখা একটা কবিতার কয়েক পংক্তি মনে পড়ে যায়। লাইনগুলো এরকম -

বেগমসাহেবাও আজ বেড়িয়ে এসে ঘাসের ধারে
বেঞ্চে বসলেন ঃ ভাবলেন কতোটাই বা দূর
একটা বিচ্যুত পাতার থেকে তার গাছ
দেখলেন চন্দ্রমার কাছাকাছি গভীর বনে
কারা আজ গৃহপালিতকে ছেড়ে দিয়ে গেলো।

(বিচ্যুতি)

আমার প্রথমদিকের কবিতা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খেলার নাম সবুজায়ন' (১৯৯০-২০০০) থেকে। এই কয়েক পংক্তির উল্লেখ করলাম কবিতার মুদ্রায় চলচ্চিত্রের রকমারি ছাপের কথা বোঝাতে। ওপরের পংক্তিগুলো নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্র ভাবনাজাত। অথচ সে এমন এক ছায়াছবি যা শেষ পর্যন্ত তোলা হয়নি। এমনকি তার কোনো চিত্রনাট্যও লেখা হয়নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো এক ('অনুবর্তন' ?) উপন্যাসের কথা সত্যজিৎ রায় ওঁর এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন। প্রথম সম্ভবত ১৯৮৪ সালে শ্যাম বেনেগালের তোলা তথ্যচিত্রে, পরে ১৯৯০/৯১ সালে 'আনন্দলোক' পত্রিকায়। লেখকের দৃশ্যকল্পনা বা চিত্রশক্তি, যা চিত্রনাট্যকারের বিরাট কাজ করে দেয় কতসময় - এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে সত্যজিৎ দুটো দৃশ্যের কথা বলেছিলেন।

একটা কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র সেই দৃশ্য যেখানে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা আসন্ন মৃত্যুভাবনায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে অধিকতর অশ্রু-ভারাতুর ; আর সেই সময় কমলকুমার বর্ণনা করছেন গঙ্গার ধারে বাঁধা একটা নৌকোর গায়ে আঁকা চোখের কথা - নীল রঙের চোখ, যার ছায়া নদীর জলে প'ড়ে ছলছল করে ; চোখ নয় তার ছায়া - যে দৃশ্য পরে গৌতম ঘোষ ওঁর ছবিতে হুবহু ব্যবহার করেন।

অন্য উদাহরণ হিসেবে ওই বিভূতিভুষণের লেখা। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এক মধ্যবিত্ত কি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক টানাটানি আসাতে তারা ঠিক করে পরিবারের মানসিক ভারসাম্যহীন কাকা-কে এক বনাঞ্চলে ছেড়ে দিয়ে আসবে। সে পরিবারের একটা ছোটো ছেলে আছে - পাগলাটে কাকার প্রতি তার একটা টান ছিলো। একটা গামছা-পুঁটুলিতে প্রয়োজনীয় কিছু নিত্য-ব্যবহার্য বেঁধেছেদে দিয়ে, একটা ঝোপের ধারে তাকে বসিয়ে দিয়ে গোটা পরিবার যখন ফিরে আসছে, সেই বালকটি পেছন ফিরে তাকায় - দ্যাখে, ঝোপের ওধার থেকে ধোঁয়া উঠছে ওপরে - অর্থাৎ কাকা বিড়ি ধরিয়েছে।

সত্যজিৎ বর্ণিত বিভূতিভূষণের লেখা এই দৃশ্যটা আমার মাথায় চিরতরে গেঁথে যায়। সেখান থেকেই কবিতার ওই অংশ। আর বলাই বাহুল্য, 'গৃহপালিত' শব্দটায় আমি একাধিক অর্থের পুর ঠেসে দিতে চেয়েছিলাম যাতে ঝুঁকি নিতে চাওয়া পাঠক কেবল চারপেয়েতে আটকে না যান।

এভাবেই সিনেমা কবিতার ওপর ছায়া ফেলে। এমনকি না-তোলা সিনেমাও। বাংলা সিনেমার গোড়ার দিক থেকেই কয়েকজন কবি সিনেমা জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। নজরুল একটি বা একাধিক ছবি অভিনয় করেছেন। প্রমথেশ বড়ুয়া ও পঙ্কজ মল্লিকের প্রস্তাবনায় 'মুক্তি' ছবিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যবহার সৃষ্টিশীল বাংলা ছবির এক অসমান্তরাল যৌথতা, সে সত্যজিৎ যাই বলুন।

এক নামী বাঙালী কবি ফিলিম্ ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়মিত কাজ করতেন - প্রেমেন্দ্র মিত্র। যিনি চিত্রনাট্য লেখা শুধু নয় স্বয়ং ছবি পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এটা ভয়ংকর বিস্ময়কর যে প্রেমেন মিত্তির কবিতা ও চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণ দুঘরে ক'রে রেখেছিলেন - যেন মিশে গেলেই বিপদ। ওঁর ছবিতে কবিতা যেমন নেই তেমনি কবিতায় চলচ্চিত্র।

সম্ভবত প্রথম সফল বাংলা সিনেকবিতা এসেছে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের হাত ধরেই। একই সঙ্গে এসেছে কবিতাচিত্র। সে অর্থে বুদ্ধদেবকে হয়তো বাংলার জ্যঁ কখতো বললে খুব অত্যুক্তি হয়না। যদিও মনেপ্রাণে পূর্ণেন্দু পত্রী হয়তো আরো বেশি কখতো ছিলেন। কখতো ওঁর প্রিয় পরিচালকদের একজন। চলচ্চিত্রে সরাসরি কবিতাভাবনার উপস্থাপনা হয়তো ওঁর ছবিতেই প্রথম। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছেড়া তমসুক', 'স্ত্রীর পত্র', 'স্বপ্ন নিয়ে', 'মালঞ্চ' ইত্যাদি ছবির চিত্রনাট্যে শুধু নয়, চিত্রভাষাতেও কবিতার গভীর ব্যবহার থাকতো। (এ প্রসঙ্গে পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে - পূর্ণেন্দু যে কাহিনীকে ভিত্তি করে 'স্বপ্ন নিয়ে' করেন, সেই একই কাহিনী অবলম্বনে দশক-দেড়েক পরে মৃণাল সেন করেন 'খন্ডহর'। দুটো ছবির কাব্যগুণই চর্চা করার মতো। সে কাহিনী কিন্তু খোদ প্রেমেন মিত্তিরের, যিনি নিজে কবি, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন এই গল্প নিয়ে ছবি করেননি, এমনকি এই জাতের ছবির ধারকাছ মাড়াননি। মোটমুটি ঝুঁকিহীন বানিজ্যিক ছবির জগতে থেকে গেছেন।)

অনন্য রায় আর একজন প্রচন্ড প্রতিভাবান কবি যিনি ঋত্বিক ঘটকের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ওঁর সহকারী হয়ে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্প' - এ কাজ করেন। অনন্যর কবিতায় কতোটা ছায়াছবির প্রভাব থাকতো জানিনা তবে অত্যন্ত সার্থক এক বাংলা সিনে-দীর্ঘকবিতা লেখেন সুব্রত সরকার। ওঁর বইদীর্ঘ কবিতা 'ফারেনহাইট ৪৫১' ত্রুফোর ছবির দ্বারা অনুপ্রাণিত। একইভাবে অমিতাভ মৈত্র-র বহু কবিতা চলচ্চিত্র প্রণোদিত। ১৯৯০-এর দশকে বারীন ঘোষাল 'গিনিপিগ, একটি তথ্যচিত্র' নামে এক মৌলিক সাহিত্যের বই লেখেন যা কারো কারো মতে কবিতা, কারো মতে 'তথ্যকাহিনী', কারো মতে উপন্যাস। সম্প্রতি কোনো কোনো তরুণ কবি পরীক্ষাসিনেমা নির্মাণে নেমেছেন। কম বাজেটের স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করলেও এঁদের কাজে কোথাও কোথাও কবিতা ও সিনেমা এক ঘনমিশ্রণে পরিণত হয়। এদের মধ্যে অরূপরতন ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্লেজ সঁদ্রারকে বাদ দিলে আরো অনেক ফরাসী কবি সিনেমার সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং কম বেশি তাঁদের লেখার মধ্যে সিনেমার প্রভাব কাজ করেছে। আঁতোয়ান আর্তো প্রথম জীবনে ছিলেন ফিল্ম ও মঞ্চাভিনেতা, পরে ছবি তৈরির কাজে ব্রতী ও ব্যর্থ হন। ওঁর লেখার মধ্যে যেমন ছায়াছবির প্রভাব ছিলো তেমনি স্বয়ং অ্যাপলিনেয়রের কোনো কোনো কোনো লেখার মধ্যেও। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ উদাহরণ অবশ্যই কবি ও চলচ্চিত্রকার জ্যঁ কখতো (Jean Cocteau)। কখতো সেই ব্যতিক্রমী শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম যিনি সিনেকবিতাও যেমন লিখেছেন তেমনি পোয়ফিল্ম বা কবিতাচিত্র। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত ১৯৯০-এ ও একুশ শতকে এসে, হয়তো মাল্টিমিডিয়ার কারণেই সিনেকবিতার উদাহরণ বেড়েছে। ফরাসী কবি অলিভিয়ের কাদিও (Olivier Cadio) ও আরো তরুণতম কবি পীয়ের আলফেরি (Pierre Alferi, যিনি পরীক্ষাসিনেমার রচয়িতাও) দুই উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে ইরানের বিখ্যাত পরিচালক আব্বাস কিয়েরোস্তামিও (Abbas Kiarostami) কৃতি কবি। জর্মনী, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, ইরান - সর্বত্রই, সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও, সিনেকবিতার প্রচলন বেড়েছে।

জন অ্যাশবেরির কবিতায় সিনেমার প্রভাব প্রগাঢ়। ২০০৭ সালে একটি সাক্ষাতকারে অ্যাশবেরি আমাকে কানাডিয়ান চলচ্চিত্রকার গাই ম্যাডিনের (Guy Maddin) ছবির কথা বলেন। ম্যাডিনের ছবি আমেরিকার সমসাময়িক কবি পিটার গিৎসিকেও (Peter Gizzi) প্রভাবিত করে। পিটার আরো অনেক কবিতা আমাকে দেখান যা সিনেমার অনুপাঠের ফল। এমন কয়েকটা কবিতা ২০০২-২০০৩ সালে কবিতা পাক্ষিক পত্রিকায় বিশেষ পিটার গিৎসি সংখ্যায় আমি অনুবাদ করি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে দুজন এ পর্যন্ত স্বল্পপরিচিত কবি আস্তে আস্তে কিম্বদন্তী হয়ে উঠছেন - সেই জর্জ অপেন ও জ্যাক স্পাইসার, দুজনেই এক এক সময় ফিল্মের থেকে প্রভাব নিয়েছেন। জ্যঁ কখতোর বিখ্যাত ছবি 'অর্ফে' বা অর্ফিউসের নায়ক ছিলেন কবি। তিনি গাড়ির রেডিও থেকে দৈববাণীর মতো কবিতার লাইন পেতেন। স্পাইসার এই ছবির দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে রেডিওর ভাষা থেকে ছেঁকে নিতেন ওঁর কবিতার কিছু মশলা।

উল্টোভাবে ভাবলে 'কবিতাচিত্র' বা poefilm - যা মূলত ফিল্ম, কবিতার রেণুমাখা। কিভাবে কোথায় সে কবিতার রেণু সেটা অবশ্য পাঠকের/গ্রাহকের/দর্শকের রুচির ওপর নির্ভর করবে। ফলে কারো কাছে অ্যালফ্রেড হিচককের Vertigo স্রেফ থ্রিলার মনে হবে কারো কাছে প্রত্যন্ত কবিতা।

কিন্তু কোন কোন মৌল থাকলে পোয়ফিল্ম ? Poetic cinema বা poetic film বলে কিছু বর্ণনক চলচ্চিত্রের মানুষজন বারেই বারেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পোয়ফিল্মের বিশিষ্টতা এখনো অতিরিক্ত অস্বচ্ছ। কাকে বলা যায় কবিতাচিত্র ?

অ) যে ছবি কোনো কবিতাকে অবলম্বন করে ?
আ) কবি বা কবির জীবন বা জীবনের ঘটনা নিয়ে গড়া ছবি ?
ই) যে ছবির চিত্রনাট্যে কবিতার ব্যবহার রয়েছে ?
ঈ) দৃশ্যগত বিমূর্ততা যে ছবির প্রধান উপজীব্য ?
উ) নাকি যে ছবিতে চিত্রভাষা - তার শটভাগ, দৃশ্যপরিকল্পনা, ক্যামেরা ও লেন্সের, আলো ও ছায়া, সঙ্গীত, সংলাপ ও শারীরভাষার বিশেষ ব্যবহার কবিতার ভাষাকে মনে করায় ?

হয়তো এর সবকটাই পোয়ফিল্ম বা হয়তো নয়।

এমন একটা ছবির দিকে এই প্রসঙ্গে ফিরি যার কবিতাচরিত্র নিয়ে অলোচনা আজো থেমে যায়নি। যদিও ছবিটাকে 'প্রথম সুররিয়ালিস্ট ছবি' হিসেবেই বেশি দেখা হয়। ল্যুই ব্যুনিউয়েল ও সালভাদর দালির সুবিখ্যাত বা অপখ্যাত ছবি 'আঁ শিয়েন আন্দাল্যু' (Un Chien Andalou)। এই ছবি ও তার গড়ে ওঠার কাহিনী ও পরবর্তী প্রভাব নিয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বাকবিতন্ডা এখনো এত বছর পরেও থেমে যায়নি। সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাতকারে ব্যুনিউয়েলের ছেলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন - ১) দালির সাথে তার বাবার সম্পর্ক, এই ফিল্ম রচনাকালে তাদের প্রকৃত যৌথতা আর ২) ফিল্মের দৃশ্যকল্পের নেপথ্যভাবনা। জুনিয়র ব্যুনিউয়েল যা বলেছেন তার অনেকটাই হয়তো ওঁর নিজের ব্যক্তিগত মতামত আবার তা নাও হ'তে পারে। এবং এইসমস্ত কথাবার্তা 'আঁ শিয়েন আন্দাল্যু'কে ঘেরা হাজারো তাত্ত্বিক আলোচনা, ও ছবিটার ক্রমবর্ধমান মিথিফিকেশনের ওপর জল কেন, ক্ষার ঢেলে দিতে পারে।

শিল্পের ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা বড় লাভ হয়। মিথ চুর চুর হয়ে ভেঙে যায়। তৎসঙ্গে অজস্র অজানা বা অল্পজানা ঘটনার সুতোয় সম্পূর্ণ অবান্তর ও বিসদৃশভাবে গাঁথা কত উপকাহিনী ও তথ্য নতুন ধারণার দিকে আমাদের ঠেলতে থাকে। বহুগামী এক আন্তর্লিপিতা হয়তো পুরনো মিথকে ভেঙে নতুন মিথ গড়ার কাজে লেগে পড়ে। সেই নতুন মিথকে আটকে বরং নানা তথ্যের মিশেলে যাই। খুঁজি এমন প্রমাণ যা দেখাতে পারে কবিতাকে সিনেমার দোসর ক'রে।

জুনিয়র ব্যুনিউয়েলের সাক্ষাতকারে যাবার আগে দেখা যাক কেন বা কোথায় কবিতার সাথে এই 'আন্দালুসিয় কুকুর'-এর সম্পর্ক। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই ছবি এদেশে, বিশেষত কলকাতা শহরে অনেকেই দেখেছেন। এখানে গল্পের কোনো বালাই নেই, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের কোনো আপাত সেতু নেই অনেক সময়ে। একরাশ অত্যন্ত বির্মূত দৃশ্যপ্রতিমা ও প্রতীতি এমনভাবে ঠাসা যে দৃশ্যের জাদুই ছবির একমাত্র বিষয় বলে মনে হয়। অনেকেই ছবি দেখে বেরিয়ে এসে আজো বলবেন যে এটা 'কবিতা', এমন কবিতা যা গল্প বলবার বা কোনো নির্দিষ্ট বার্তা দেবার কোনো চেষ্টা না করে কেবলমাত্র দৃশ্যকল্পের মধ্যে দিয়ে কিছু ভাবনাকে ছুঁয়ে যায়। আর বাকি যা কিছু তা এতই ব্যক্তিগত যে তার সাথে আমাদের কারো কোনো সম্পর্ক থাকতে পারেনা। সেসব লুই ব্যুনিউয়েল ও সালভাদর দালির একান্ত বা যৌথ সম্পত্তি। এর পাশাপাশি একদল পশ্চিমী পন্ডিত, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ও ফিল্মী, ছবিটার একাধিক সুনিপুণ ব্যাখ্যা পেশ করেন, রূপক ছাড়িয়ে নেন দৃশ্য থেকে - এবং এর ফলে ছবিটাকে মনে হতে থাকে বির্মূত দৃশ্যকল্পের আড়ালে বোনা এক ঠাসবুনোট প্রবন্ধ। প্রবন্ধের বিষয় - স্বপ্ন, কাম, ক্ষমতা, সৃষ্টি, জান্তবতা, শিল্প, ধর্ম ও আধুনিক সমাজের তাদের পারস্পরিক অতি দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক। স্কলার বা পন্ডিতদের কাজই এই - যেটা অস্পষ্ট সেটাকে স্পষ্টতর ক'রে তোলা। এর ভালো দিক হলো এতে করে একটা পাঠসম্ভাবনা তৈরি হয়। আর খারাপ দিক এই যে একটা পাঠসম্ভাবনা

গড়ে ওঠার সাথে সাথে অজস্র অন্য পাঠসম্ভাবনা খুন হয়ে যায়। বিশেষত আধুনিক (অর্থাৎ বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোঝানো হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন, স্পষ্টতই উত্তরাধুনিক নয়) সাহিত্য শিল্প-আলোচনায় যা হতো/হয়।

একটা উদাহরণ দিই। সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম চর্চিত দৃশ্য নিয়ে আরেকবার কিছু কথা হোক। যাঁরা এখনো 'আঁ শিয়েন আন্দালু' দেখেননি তাঁদের জন্য দৃশ্যটা আরেকবার সংক্ষেপে বর্ণনা করি। ছবির শুরুতেই এই দৃশ্য। ব্যুনিউয়েলকে এক মেঘলা সন্ধ্যায় ছুরি হাতে পায়চারি করতে দেখা যায়। তার পরের দৃশ্যে আকাশের সম্পূর্ণাকার চাঁদের ডিস্কের ঠিক মাঝখান দিয়ে উড়ে যায় এক চিলতে মেঘ। চাঁদের সাদা লুচি মাঝ বরাবর ছিঁড়ে যায়। ঠিক পরের সমান্তরাল দৃশ্যে কাহিনীর নায়িকা চেয়ারে বসে, এক পুরুষের হাত তার ডান চোখটা টেনে খুলে বড় করে আর তার মাঝখান দিয়ে ছুরি টেনে দেয়। দু টুকরো চোখের পেট থেকে বেরিয়ে আসে থকথকে আঁখিরস। এই রূপকতা, যাকে অনেকে সিনেমার পর্দায় কবিতার সর্বোচ্চ বা সর্বপ্রথম বিমূর্ত-কাব্যিক ব্যবহার বলেছেন, তলিয়ে দেখলে কিন্তু কবিতার রূপকতার উল্টোটাই পাওয়া যায়। তবে সেখানে যাওয়ার আগে এই দৃশ্যের ইতিহাস ঘাঁটা যাক কিছুটা।

চন্দ্রমেঘ ও চোখকাটার দৃশ্যক্রম
ক) ব্যুনিউয়েল আকাশের দিকে

খ) চাঁদ চিরছে মেঘ

গ) ছুরি এগোচ্ছে চোখের দিকে

চন্দ্রমেঘ ও চোখকাটার দৃশ্যক্রম
ঘ) টেনে বড় করা চোখ

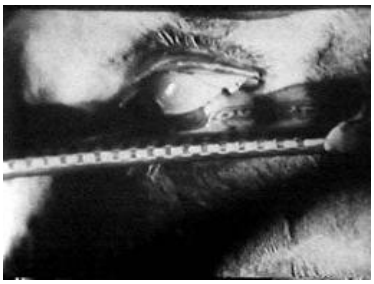

ঙ) ছুরি চিরে দেয় চোখ

ছবিটা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করতে ব্যুনিউয়েল দালির ফিগুয়েরার বাড়িতে কয়েকদিন থাকতে আসেন। এটা ১৯২৭ সালের ঘটনা। সেই সময়েই একদিন স্বপ্নে ব্যুনিউয়েল এমন দেখেন -

'আমিই দালিকে বলি চলো একটা ফিল্ম করি। সে বলে - কাল রাতে দেখলাম আমার হাতের তালুতে একদল পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। লেখকের সংযোজন - এই ফিল্মের আর একটা দৃশ্য]। আমি বললাম - তাই ? আর আমি দেখলাম আমি ছুরি দিয়ে একজনের চোখ ফাঁক করে দিলাম।...'

চলচ্চিত্র-প্রাবন্ধিক লিন্ডা উইলিয়াম্স এই রূপকের প্রসঙ্গে লিখেছেন "metaphor within a syntagm"। যেখানে দ্বিত্বের তুলনামূলক সম্পর্কটা উল্টে যায়। অর্থাৎ অমুক তমুকের উপমা না হয়ে তমুক অমুকের হয়। এখানেও তাই। তবে এর বিশিষ্টতা বোঝাতে একটা বাংলা কবিতার একাংশ নিয়ে আসি আগে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার
অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র
হলো, মা।

জরাসন্ধ / শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অসাধারণ রূপকতা। এক ওডর-অ্যাসর্টমেন্ট বা এক পসরা গন্ধে ভরা এক জলাভূমির ইন্দ্রিয়াতুর অনুভাবের সাথে শক্তি মিলিয়ে দেন মায়ের ভাঁড়ারের সারি-সারি মশলাপাত্রের স্বাদগন্ধের আয়োজনকে। কবিতার প্রথাগত রূপক জীবনের একটা অনুভূতি, বস্তু, ক্রিয়া বা ভাবনার সাথে হয় নিসর্গের কোনো অবস্থা বা ভঙ্গির মিল খোঁজে নয় উল্টোটা। কিন্তু এখানে, 'আঁ শিয়েন আন্দালু'র এই দৃশ্যে প্রকৃতির এক ছবির সাথে মিল দেবার প্রয়োজনেই যেন ছুরি এগিয়ে আসে চোখ চিরতে। অর্থাৎ মানুষের হাত দিয়ে একটা ক্রিয়া রচনা করে দেখানো হয় যা এক প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে মেলে। প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে মিল দিতেই যেন মানুষের এই ক্রিয়ারূপ। নারীচক্ষুর মতো চাঁদ নয়, বরং নারীচক্ষুকে আঙুল দিয়ে টেনে বড় ক'রে চাঁদের মতো করা। ছুরির মতো মেঘ নয়, মেঘের ভাসমানতার সমান্তরালে ছুরিটা চালানো। শুধু 'metaphor within a syntagm' নয়, এক এস্থেটিক বা নান্দনিক বৈপরীত্যও এখানে গড়ে তোলা হলো। অপরূপ সুন্দর মেঘময় চান্দ্র দৃশ্যের রূপক হিসেবে এলো বিভৎস নৃশংসতা। এক সাম্প্রতিক সাক্ষাতকার থেকে জানতে পারি ব্যুনিউয়েল (তখন লস অ্যাঞ্জেলিসে থাকতেন, হলিউডে কাজ পাননি তেমন, শেষে মার্কিন ছবির ইস্পানি অবশীর্ষক রচনা করছেন ; সামান্য রোজগার) ওঁর এই ছবিটা কাউকে কাউকে দেখাতেন হলিউডের কোনো এক নড়বড়ে বাতিল প্রোজেকশান রুমে। সেই ঘরের প্রোজেকশনিস্ট ছিলো এক চৈনিক। সে ভদ্রলোক প্রত্যেক শোয়ে ওই দৃশ্য এলে মুখ বিকৃত ক'রে ভয়ার্ত চিৎকার করতো। ব্যুনিউয়েল প্রথম প্রথম তাকে বকেছিলেন, পরে মুচকি হাসতেন। শুধু তাই নয়, পারী শহরে একটি থিয়টারে প্রথম ৪৫ দিন ছবি দেখানোর মধ্যে অসংখ্য দর্শক জ্ঞান হারান, এক ভদ্রমহিলা হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যান, এক যুবতীর গর্ভস্রাব হয়। অবধারিতভাবে পুলিশি হামলাও।

কেউ কেউ বলেন ব্যুনিউয়েলের এই স্বপ্নদৃশ্যের সঙ্গে একটা সত্যিকারের কবিতার যোগ আছে। সে কবিতা ব্যুনিউয়েল, দালির ঘনিষ্ঠ বন্ধু গার্সিয়া লোরকার লেখা। ১৯২৪ সালে লেখা একটা কবিতা লোরকা ব্যুনিউয়েলকে উদ্দেশ্য করেন। কবিতার একটা পংক্তি এইরকম - 'বিরাট চাঁদ চকচক করে আর ঘোরে/ শান্ত মেঘের ওপরে'। মজার ব্যাপার এই যে 'আঁ শিয়েন আন্দালু' শুরু হবার পর এই লোরকার সাথেই ব্যুনিউয়েলের ব্যাপক শৈল্পিক সংঘর্ষ শুরু হয়, যা অবিলম্বে ব্যক্তিগত পর্যায় পৌঁছয়। কেন ছবির নামে 'কুকুর' শব্দ এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ছবির কোথাও কোন কুকুর নেই বা তার উল্লেখ নেই। এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে এগোতে এগোতে একাধিক তথ্য পাই। লোরকা নাকি একসময় ওই ছবির প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমিই ওই ছবির অনুপস্থিত কুত্তা'। আবার ব্যুনিউয়েলের ৭৫-৭৭ সালের সাক্ষাতকারমালায় পাওয়া যাচ্ছে -

খোসে দেলা কোলিনা : প্রথম প্রশ্ন 'আন্দালুসিয় কুকুর' ছবির নামে কেন ? ফ্রান্সিস্কো আরান্দা ওঁর বইতে লিখেছেন যে আপনারা কয়েকজন নাকি রেসিদেন্সিয়া দে এস্তুদিয়ান্তেসে (ছাত্রাবাসে) আন্দালুসিয় কবিদের নিয়ে মজা করতে চেয়েছিলেন ? সেখান থেকেই ছবির নাম

ল্যুই ব্যুনিউয়েল: সে সবটা নয়। মানুষের যখন নিজেদের কাজের জন্য রেফারেন্স লাগে তারা নিজেরা যা খুঁজছেন তার মতো সূত্র ঠিক কেমন করে যেন পেয়ে যান। ফ্রেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা আর আমার মধ্যে একটা বিবাদ চলছিলো বেশ কয়েকবছর ধ'রে। ১৯৩০-এর দশকে আমি যখন নিউ ইয়র্কে থাকি [উল্লেখ্য, ফ্র্যাঙ্কোরাজের প্রকোপ থেকে বাঁচবার তাগিদে ব্যুনিউয়েল তখন দেশছাড়া, আংখেল দেল রিও আমাকে বলে যে ফ্রেদেরিকো, সেও তখন ওখানে, তাকে বলেছে, 'ব্যুনিউয়েল ছোটো এক স্তূপ পায়খানা করেছে, তার নাম দিয়েছে 'আঁ শিয়েন আন্দালু', আর সেই আন্দালুসিয় কুত্তাটি আমি'। কিন্তু সেটাও ভুল। ওটা ছিলো আমার একটা কবিতার বইয়ের শীর্ষক। প্রথমে আমি আর দালি ভেবেছিলাম আমরা ফিল্মটার নাম দেবো - ' Es peligroso asomarse al interior' - 'ভেতরে হেলান দেওয়া বিপজ্জনক', ট্রেনের জানলার ভেতরের দিকে যা লেখা থাকে, ঠিক তার উল্টো। কিন্তু পরে আমাদের মনে হলো এটা নাম হিসেবে ঠিক জুতসই নয়, বড় আক্ষরিক। তখন দালি বললো, 'তোমার বইয়ের শীর্ষকটাই ব্যবহার করি না কেন ?'। শেষ পর্যন্ত আমরা সেটাই করলাম।

ছবির আরেকটা দৃশ্যের কথায় আসি। এই দৃশ্যে আমরা দেখি জানলার ধারে নায়িকা (যদি নায়িকা ব'লে ছবিতে আদৌ কেউ থেকে থাকে) ছটফট করছে, আর নায়ক তার দিকে এগোতে চাইছে। কিন্তু নায়কের পিঠে বাঁধা দড়ির অন্যপ্রান্তে আটকানো এক প্রকান্ড গ্র্যান্ড পিয়ানো যার মাধ্যাকর্ষণে নায়ক এগোতে পারছেনা ; সেইসঙ্গে দুই ধোপদুরস্ত পাদরি নায়কের শরীরে বাঁধা আরেকটা দড়ির প্রান্ত ধরে তাকে টেনে ধরতে গিয়ে নিজেরই মাটিতে নেতিয়ে পড়ে, যদিও দড়ি ছাড়ে না। এই দৃশ্যের এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় - যে ক) নায়ক পুরুষশাসিত সমাজের শিল্পীপ্রতিনিধি আর খ) মেয়েটি তার প্রেম, জীবনের প্রতি প্রেম, যার বাধা হয়ে দাঁড়ায় গ) পিয়ানো, অর্থাৎ নায়কের শিল্প ; সে নায়কের প্রেমের পথের বৃহত্তম বাধা ; আর দ্বিতীয় বাধা ওই ঘ) ধর্মযাজকদ্বয়, মানে ধর্ম, যা দুয়ের থেকেই শিল্পীকে বিরত করতে গিয়ে ভাঁড়ের মতো সার্কাসের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে রীতিমতো হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। এই ব্যখ্যা স্যুররিয়ালিজম, ব্যুনিউয়েল ও দালির শিল্পভাবনার সাথে চমৎকার মানিয়ে যায় তাতে কিছুমাত্র সত্যের গুঁড়ো মিশে থাকুক বা না থাকুক।

ব্যুনিউয়েল-পুত্র এই দৃশ্যের র্নিমাণকল্প (এমনকি গোটা ছবির) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে ওদের দৃশ্যকল্প নির্মাণ ছিলো সম্পূর্ণ এলোপাথারি। ওই বিশেষ দৃশ্য তোলার দিনও ব্যুনিউয়েল বা দালি কেউ দৃশ্যটা নিয়ে যথেষ্ট ভাবেননি। পিয়ানোটার কথা দালি তোলেন। পাদরিদের চরিত্রাভিনেতাদের আগের দিন ব্যুনিউয়েল খবর দেন। তারা জানতেনও না কোন ভূমিকায় তারা অভিনয় করছেন। শটের মধ্যে কি কি থাকবে সে নিয়ে শ্যুটের সময়ে দালি ও ব্যুনিউয়েলের ঠাট্টা মস্করা হতো। এই মুহুর্তে একটা জিনিস আনানো হচ্ছে, পরের মুহুর্তে সব বদলে দেওয়া হচ্ছে। মূল অভিনেত্রী অভিনেতা ১৯৭৫-৭৭ সালে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে স্বয়ং ব্যুনিউয়েল বলছেন -

'আমরা স্ক্রিপ্টটা লিখি ঠিক ছ-দিনে। আমাদের মধ্যে কোনো মতান্তর ছিলো না। সেইসময়ে একে অন্যকে বুঝতাম। আমরা ঠিক করেছিলাম মনে যে প্রতিমাগুলো সর্বপ্রথম আসছে, সেই প্রথম প্রতিমাগুলো দিয়েই ছবি করবো। যা কিছু আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও শিক্ষা থেকে রীতিবদ্ধভাবে জন্মাচ্ছে সেই সব প্রতিমা আমরা বাদ দিচ্ছিলাম। প্রতিমাগুলো এমন হবে যা আমাদের চমকে দেয় আর যা আমরা দুজনেই নিতে পারছি। যেমন ধরা যাক আমি হয়তো ওকে (দালি) বললাম, 'সে কি দেখছে এখন ?', 'একটা উড়ন্ত ব্যাঙ', 'চলবেনা' ; 'বেশ এক বোতল কনিয়াক', 'ধুর' ; 'আচ্ছা এবার আমি দুটো দড়ি দেখতে পাচ্ছি...', 'মন্দ না, তারপর ?' ; 'সে দড়ি ধরে টানছে আর পড়ে যাচ্ছে বারবার কেননা অন্যপ্রান্তে একটা ভারী কিছু...', 'বাঃ ভালো ভালো, আমি চাই ও পড়ে যাক, তারপর ?' তারপর ?' 'দড়ির সঙ্গে আসছে দুটো ভারী কুমড়ো' ; 'আর কী ?', 'আর দুই মারিস্ট ভাই (পাদরি)' ; 'তারপর ?', 'একটা গোলা', 'বাজে, হবেনা, একটা শৌখিন আরামকেদারা আসুক' ; 'না, না, গ্রান্ড পিয়ানো', 'দারুণ, আর পিয়ানোর ওপরে একটা মৃত খচ্চরের মাথা '... '

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে দালি-ব্যুনিউয়েল অধিবাস্তববাদী রচনাপদ্ধতি অবলম্বনেই ছবিটা করেছিলেন - স্বয়ংক্রিয় শিল্পরচনা বা যাকে ফরাসীতে বলা হয় 'ecriture automatique'। অবচেতনের রূপকের মাধ্যমে গড়ে তোলা এক বির্মূত চিত্রভাষা যা আজো অসংখ্য পরবর্তী ছবির পাশে স্বাতন্ত্র্যে জ্বলন্ত।

সাক্ষাতকারের অংশটা পড়ে বোঝা যায় যে পিয়ানোর আইডিয়াটা ছিলো ব্যুনিউয়েলের। যদিও দালি অন্যত্র বলেন সেটা ওঁর। পরে ব্যুনিউয়েলও অন্যত্র বলেন পিয়ানোর ভাবনাটা দালির। এখানে সত্যি-মিথ্যা অস্পষ্ট। জুনিয়র-ব্যুনিউয়েলের সব কথাও আমি মেনে নিতে পারিনি। এর অনেক কারণ আছে। এই ছবির পরেই দালি ও ব্যুনিউয়েলের সম্পর্কে চিড় ধরে। ওঁরা আর একটা ছবি করেন এরপর - 'লাজ দ'অর' (স্বর্ণযুগ) - যদিও সে ছবি সকলেই জানেন যতোটা ব্যুনিউয়েলের ছবি ততোটা দালির নয়। দালি, সত্যি বলতে কি, সিনেমা কিভাবে তৈরি হয় তার প্রযুক্তির বিশেষ কিছু বুঝতেন না, ছবি তৈরি হয়ে গেলে তার দায়িত্বও নিতেন না, স্রেফ চিত্রনাট্য রচনা ও বিশেষত ছবির দৃশ্যব্যঞ্জনা নির্মাণের কাজেই ওঁর আগ্রহ ছিলো বেশি। সালভাদর দালির আত্মম্ভরিতাও অতি বিখ্যাত। যেটুকু করেছেন তার দশগুণ কৃতিত্ব চাইতেন। স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর সামরিক শাসন আসার পর প্রায় সমস্ত লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবিকে দেশ ছাড়তে হয়। যাঁরা থেকে যান হয় তাদের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়, মেরে ফেলা হয় আর নয় তাঁরা সামরিক শক্তির গোলাম হয়ে যান। সালভাদর দালি হয়েছিলেন শেষেরটা। ফ্র্যাঙ্কো সরকারের শিল্প-দালাল। যে ফ্র্যাঙ্কো ওঁদের তিনজনের একজন - অপর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সারাদেশের প্রিয়তম কবি গার্সিয়া লোরকাকে খুন করে, সেই শাসনকে সমর্থন করার পর থেকেই দালির বহু প্রাক্তন বন্ধু - ইস্পানী ও ফরাসী - ওঁর থেকে দূরে সরে যান। ব্যুনিউয়েলও। এছাড়া জুনিয়র ব্যুনিউয়েল যে মনে করেন 'আঁ শিয়েন আন্দাল্যু' তোলার সময় দালির চেয়ে তার বাবারই বেশি ভূমিকা ছিলো সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় কেননা ব্যুনিউয়েলের অনেক সাক্ষাতকারে একই কথা রয়েছে, রয়েছে সে ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথাতেও। স্বয়ং ব্যুনিউয়েল বেশ অবাকই হয়েছিলেন যখন দালি ছবির অনেক দৃশ্য তোলার সময় লোকেশনে আসা বন্ধ করে দেন। চিত্রনাট্যের অনেকগুলো স্তরের প্রথম দু-একটা ছাড়া পড়েও দেখেননি। অথচ অজস্র সাক্ষাতকারে 'আঁ শিয়েন আন্দাল্যু'র জন্য রীতিমতো টেনে-হিঁচড়ে কৃতিত্ব নিয়েছেন সালভাদর দালি।

'আঁ শিয়েন আন্দাল্যু' ছবিটা নিয়ে কবিসমাজে বিস্তর কথা চালাচালি হয়। নানা রকম প্রতিক্রিয়া। নানা চাপা উষ্মা, উপহাস, তীব্র ভক্তি, ভালোবাসা ও অসূয়া। এসব হবার কারণই বা কি ? লোরকার সাথে ব্যুনিউয়েলের বিবাদ ও দূরত্ব এই সময়ে তুঙ্গেই বা ওঠে কেন, আর কেনই বা সুররিয়ালিস্টরা ছবিটাকে বয়কট করেন, ব্যুনিউয়েলকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, তারও আগে আরো মৌলিক প্রশ্ন - দালি ও ব্যুনিউয়েল দুজনেই স্পেনীয় হওয়া সত্ত্বেও ছবিটার নাম কেন ফরাসী ? - এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে গেলে পাতার পর পাতা লিখে যেতে হয়। তার চেয়ে বরং ছবিটাকে ঘিরে কবি ও কবিতার টেনশনের কথা হোক।

স্যুররিয়ালিজম আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই কেবলমাত্র ব্লেজ সঁদ্রারই নন, একাধিক পারিসিয় কবি সিনেমা অনুপ্রাণিত কাব্য বা একটা অধিবাস্তব চিত্রনাট্য লেখার চেষ্টা করেছেন। ফিলিপ সুপো (Phillipe Soupault) লিখেছেন 'Poèmes Cinématographiques' (চলচ্চিত্রকাব্য), আঁতোয়ান আর্তো লিখেছেন একাধিক কবিতা যার মধ্যে মনে পড়ছে 'Les Dix-huit secondes' (আঠার সেকেন্ড), তেমনি রয়েয়ার দেনো লিখেছেন 'Les Mysteres du Métropolitan' (নগররহস্য) ও অন্যান্য কবিতা, বেঁজামঁ পেরে (Benjamin Perét), জর্জ হুগনেত (Georges Hugnet) প্রমুখের কিছু কবিতা, সম্প্রতি পুনরাবিস্কৃত ফ্রান্সিস পিকাবিয়ার (Francis Picabia) 'Sursum Corda' - এমন আরো কয়েকজন কবির আরো কিছু কবিতা। অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো কবি সমাজে প্রায় একই সময়ে রচিত এত চলচ্চিত্র-অনুপ্রাণিত কবিতা পাওয়া যায় না। ছবিটা ব্যুনিউয়েল প্রথম দেখান পারী শহরের একটা হলে, ১৯২৮ সালে। কিছু বন্ধুদের ডেকেছিলেন। কখতোকে তো বটেই। সেদিন দালি ছিলেন না। সুররিয়ালিস্ট দলের প্রায় কেউ ছবি দেখতে আসেনি। অনেক সাধারণ দর্শক ছিলেন। ব্যুনিউয়েল এক রাশ ইঁট এনে জড়ো করে রেখেছিলেন পর্দার পেছনে। ওঁর ভয় ছিলো লোকে ক্ষেপে যেতে পারে। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শকরা, অন্তত সেই প্রথম শোয়ের দর্শকরা ছবি ও ব্যুনিউয়েলকে সহর্ষ অভিবাদন জানায়। স্টুডিও-২৮ এক হাজার ফ্রাঁর বিনিময়ে ছবিটা দেখাতে রাজি হয় ও পরের কয়েক সপ্তাহে রীতিমতো ভালো ভিড় হয়। ছবি জনপ্রিয় হচ্ছে যখন ঠিক সেই সময়েই ব্রেতঁ ও অন্যান্য সুররিয়ালিস্ট দলের সাথে ব্যুনিউয়েলের আলাপ। পারীর মঁপার্নাস অঞ্চলে তখন ওঁরা আড্ডা দেন।

এই কবিদের মধ্যে ছবিটা সবচেয়ে তুমুলভাবে প্রভাবিত করে কবি জর্জ বাতাইকে (Georges Bataille)। বাতাই অধিবাস্তববাদী কবিদের মধ্যে অপেক্ষাতর অনুল্লিখিত হলেও বিশ শতকের ফরাসী কবিতার প্রণিধানযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। অনেক ফরাসীরাও ভুলে গেছেন বাতাই প্রথম যিনি আগামীদিনের কিছু নাক্ষত্রিক ফরাসী চিন্তাবিদ ও তাত্বিকদের লেখা ওঁর পত্রিকায় ছাপেন। রোলাঁ বার্থ, ঝাক দেরিদা, মিশেল ফুকো প্রমুখের প্রথম দিকের একাধিক লেখা প্রকাশিত হয় জর্জ বাতাইয়ের কাগজে। কোটর থেকে বেরিয়ে আসা চেরা বা গলা চোখের দৃশ্যকল্প বাতাইয়ের লেখায় চলে আসে সরাসরি। 'আঁ শিয়েন আন্দাল্যু'র প্রথম শোয়ের পরপরই বাতাই এক কল্পকাব্যিক উপন্যাস লেখেন, নাম 'L'Oeil' (চোখ, ১৯২৯)। কাহিনীর এক নায়কের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতো রাতের দুঃস্বপ্নে আর সে দেখতো সে মাছে রূপান্তরিত হয়েছে ; ক্র্যাম্পটন নামের মূল নায়ক এক যাজককে তার কাচের চোখ উপহার দেয় ইত্যাদি। এর পর বাতাই ১৯৩০ সালে ভ্যান গো'র আত্মহনন প্রবণতা নিয়ে একটা বই লেখেন। সেখানে তিনি গো'র ছুরি দিয়ে নিজের চোখ ওপড়ানোর চেষ্টার মনস্তাত্বিক খনিতে নামার চেষ্টা করেন। ১৯০৯ সালে লেখা একটা সূত্র ব্যবহার করেন যে বইতে এগারোটা এমন কেসের কথা লেখা হয়েছিলো যেখানে মনোরোগী নিজেদের চোখ হয় উপড়ে ফেলেন নয় ক্ষত-বিক্ষত করেন। মূলত গদ্যে লেখা হলেও বাতাইয়ের ভাষা ছিলো কল্পনাময় কাব্যিক লিপি যদিও যুক্তি তর্কে মজবুত। মানবচক্ষুকে বাতাই সৌরজগতের গ্রহের সাথে তুলনা করেছিলেন অনেক জায়গায়, বিশেষত চাঁদের সাথে।

তথ্য, চিন্তা ও লেখসূত্র ঃ

১. সিনেমা সংক্রান্ত, পূর্নেন্দু পত্রী, দেজ (১৯৯১)।
২. খেলার নাম সবুজায়ন, আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, কৌরব (২০০০)।
৩. The Memory of Tiresias, Intertextuality and Film, Mikhail Iampolski, Univ. of California Press, Berkeley (1998).
৪. Buñuel par Buñuel, Luis Buñuel (?).
৫. Objects of Desire, conversations with Luis Buñuel, José de la Colina & Tomás Pérez Turrent; Ed.&tr. Paul Lenti, Marsilio, New York (1986).
৬. The Yale Anthology of Twentieth-Century French Poetry, Ed. Mary Ann Caws, Yale University Press (2008).

==========